জল পড়ে পাতা নড়ে

বাংলা নতুন বছর ও বাঙালিত্ব

মুহম্মদ জুবায়ের

আচ্ছা, বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে আমরা পহেলা বৈশাখ বলি কেন? বৈশাখের সঙ্গে পহেলা শব্দটি বেশ বেমানান লাগে না? একইভাবে দোসরা, তেসরা, চৌঠা পেরিয়ে আবার ৫ই, ৬ই-তে চলে যাই। পহেলা, দোসরা খাঁটি বাংলা শব্দ নয়, কিন্তু সেগুলি এখন আমাদের হয়ে গেছে। অন্য ভাষার শব্দ আমাদের ভাষায় যুক্ত হবে, তা আমরা আত্মীকরণ করে নেবো, তাতে দোষের কিছু নেই। বরং এতে ভাষা আরো সমৃদ্ধ হয়, এই কথা বিজ্ঞজনরা আমাদের জানিয়েছেন।

অবশ্য এই বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞদের সব কথা যে সবসময় মান্য করা চলে তা নয়। তাঁরা সব বিষয়ে একই মাপকাঠিতে মত দেন এমন বিশ্বাস করাও দুষ্কর। কেউ কেউ বৈশাখের প্রথম দিনে রমনা বটমূলে 'এসো হে বৈশাখ'-এর পাশাপাশি কিছু বাঙালিপনা নিয়ে আপত্তি তোলেন। সারাবছরে একদিন ভোরে রমনায় ইলিশ ও কাঁচা মরিচ সহযোগে পান্তাভাত খাওয়ার উৎসবকে তাঁরা আদিখ্যেতা জ্ঞান করেন। বছরের ৩৬৪ দিন হিন্দি ছবির নায়িকাদের অনুকরণে পোশাক পরা মহিলারা বাংলা নতুন বছরের দিনটিতে শাড়ি পরেন, তা নিয়ে কতো কথা, নিন্দাবাদ! সারাবছর স্যুট-টাই বা জীনস-টীশার্ট পরা পুরুষরা পাঞ্জাবি (বাঙালিরা পাঞ্জাবি নামের পোশাক পরে কেন, তার ব্যাখ্যা কে দেবে?) পরে রমনায় আসেন, তাতে ভণ্ডামির (নরম করে বললে অসততা বা লোক-দেখানো) লক্ষণ আবিষ্কৃত হয়।

আসলে এসব বাহ্যিক আচার বা পোশাকে কী এসে যায়? বছরে একটিমাত্র দিনে যদি আমি বাঙালি পোশাক পরে আমার বাঙালিত্ব উদযাপন করি, তাতে দোষের কিছু থাকে বলে মনে হয় না। ভালো বা মন্দ যা-ই হোক, আমরা শুধু বাঙালি প্রমাণ করার জন্যে আমাদের সনাতন জীবনচর্যায় নিষ্ঠ থাকবো এবং আর সবকিছু থেকে চোখ ও মন ফিরিয়ে রাখবো – আজকের পৃথিবীর বাস্তবতায় তা খুবই অবাস্তব আবদার বলে মনে হয়।

আমাদের চোদ্দোপুরুষ চোখে দেখেনি বা কোনোদিন শোনেওনি, সেই মোবাইল ফোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের মানুষও এখন প্রতিদিন ব্যবহার করছে। বিদেশে তৈরি ট্রেনে-বাসে আমরা চড়ি তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই এই কারণে যে এগুলি দীর্ঘদিনের ব্যবহারে আমাদের জীবনচর্যার অংশ হয়ে গেছে। আমাদের দেশে চায়ের চাষ দীর্ঘকাল ধরে হলেও একদা কিন্তু ভোক্তা ছিলো শুধু বিদেশীরা। অথচ কালক্রমে এমন হয়েছে, এখন চা না হলে আমাদের প্রাতঃকাল অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গ্রামাঞ্চলে পাল তোলা নৌকার দিন চলে গেছে, এখন তা ইঞ্জিনবাহিত ও দ্রুতগামী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে 'স্পন্দন', 'উচ্চারণ' বা 'ঋষিজ'-এর মতো গোষ্ঠী পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি নিয়ে গান গাইতে শুরু করলে অনেকে তাকে বিজাতীয় অপসংস্কৃতি বলে ছিছিক্কার করেছিলেন, মনে আছে। কেউ কেউ হয়তো এখনো মানতে অনিচ্ছুক, কিন্তু পশ্চিম-প্রভাবিত সঙ্গীত, যা ব্যান্ডসঙ্গীত নামে ব্যাপক পরিচিত, আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। যা ঘটা দরকার তা হলো, এই গ্রহণের সঙ্গে নিজের সংস্কৃতির মূলটি ধরে

রাখা, চর্চা অব্যাহত রাখা। সেসব বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর অবশ্য এখনো পাওয়া যায়নি। গেলে উদ্বিগ্ন হওয়া চলে।

আবার অন্যদিকে আজকাল মার্কিনী মেয়েরা নাকফুল পরতে শুরু করেছে, বিচিত্র নকশায় মেহেদিতে হাত রাঙানো এখন খুবই ফ্যাশনদুরস্ত। আমাদের শাড়িও এদের ফ্যাশনের অংশ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। গুরু, অবতার, নির্বাণ এই ধরনের শব্দ ইংরেজি ভাষায় ঢুকে পড়েছে। এ দেশে পুরুষদের অনেককে পাঞ্জাবি-ফতুয়া পরতে দেখেছি। তারা কিন্তু কেউ বাঙালি বা ভারতীয় হয়ে যায়নি।

বিদেশে বসবাসকারী বাঙালির শতকরা ৯৯ জনই মাছ-ডাল দিয়ে হাতে মেখে ভাত খান, বাকি একভাগ কাঁটাচামচে অভ্যস্ত হয়েছেন অথবা হওয়ার চেষ্টায় আছেন। অধিকাংশই ঘরে লুঙ্গি পরেন, মহিলারা শাড়ি। অথচ জীবন-জীবিকার কারণে কর্মস্থলে অন্য পোশাক তাঁদের সবাইকে পরতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে এবং বাস্তব কারণে। আমার জানা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে চাকরির প্রয়োজনে তাঁর বহুবছর ধরে লালিত দাড়ি কেটে ফেলতে হয়েছিলো, তাতে তাঁর বাঙালিত্ব বা মুসলমানত্ব কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। বছর বছর বিদেশের বিভিন্ন শহরে বৈশাখী মেলা হয়, বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়, সেখানে এঁরা পরম উৎসাহে যোগ দেন। আনন্দ-উৎসবে দেশের আবহ তৈরি করার চেষ্টা করেন, নিজেদের বাঙালি পরিচয়টিকে সগর্বে উদযাপন করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মাপের লেখক বাংলাদেশে খুব বেশি জন্মাননি। বিদেশে বসে রচিত তাঁর সাহিত্যকর্মে যতোটা বাংলাদেশের মানুষ ও মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, ঢাকায় বসে সেই মাত্রায় তেমনটি কেউ করেছেন বা করতে পেরেছেন এমন উদাহরণ খুব বেশি নেই। ওয়ালীউল্লাহ স্যুট-টাই পরা মানুষ ছিলেন, স্ত্রী ছিলেন ফরাসি। অথচ তিনি যে কতোখানি বাঙালি ছিলেন তার নিদর্শন আছে তাঁর রচনায়। আমাদের লুঙ্গি-পরা ভাসানী চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুরাগী ও অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাঙালিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করবে কে? সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে আমাদের দেশে যাঁরা একদা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কেও কমবেশি একই কথা বলো চলে। আজকের একক শক্তিধর পশ্চিমী বিশ্ব, আরো স্পষ্ট করে বললে একচক্ষুবিশিষ্ট দানব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পৃথিবী শাসন করে । তার প্রভাব-প্রতিপত্তির সম্পূর্ণ বাইরে থাকার চিন্তা এখন আকাশকুসুম কল্পনা এবং এটিই বাস্তব। হিন্দি চলচ্চিত্রের প্রভাব আমাদের সমাজে কিছু অবশ্যই আছে। কিন্তু তার ফলে আমাদের বাঙালি পরিচয়টি সংকটের সম্মুখীন, এমন মনে করার কোনো কারণ দেখি না। পরবাসে দুই দশক কাটানোর পরেও আমি ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখি না, স্বপ্নে বাংলায় কথা বলাবলি হয়। অথচ দিবসকালে কর্মক্ষেত্রে, দোকান-বাজারে সারাক্ষণ ভিনদেশী ভাষা শোনা এবং বলা বাধ্যতামূলক। সুতরাং যাঁরা বাংলাদেশের মাটির আরো নিকটবর্তী আছেন, তাঁদের পক্ষেও বাঙালি না থাকা সম্ভবপরই নয়।

প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে, কারো কারো মতে অপকর্ষ, আকাশবাহিত হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরুর সবকিছুই এখন আমাদের বসার ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমাদের ভালোমন্দও আজ সারা পৃথিবীর মানুষ দেখতে পাচ্ছে। সংস্কৃতি মূলত মানুষের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি – তা কোনো অনড়, স্থবির, জড় বস্তু নয়। তা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও বহমান। শুনলে অনেকে তেড়ে আসবেন, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বাংলা নববর্ষের সকালে রমনায় গীটার ও ড্রাম সহযোগে 'এসো হে বৈশাখ' গাওয়া হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিভিন্ন সংস্কৃতির ভেতরে দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টি চিরকাল ঘটে এসেছে, ঘটবেও। কারো পছন্দ হোক বা না হোক।

mz1971@gmail.com